মাল্যবান

জীবনানন্দ দাশ

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

সারা দিন মাল্যবানের মনেও ছিল না; কিন্তু রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে অনেক কথার মধ্যে মনে হলো বেয়াল্লিশ বছর আগে ঠিক এই দিনেই সে জন্মেছিল—বিশে অঘ্রান আজ।

জীবনের বেয়াল্লিশটা বছর তাহলে চলে গেল।

রাত প্রায় একটা। কলকাতার শহরে বেশ শীত, খেয়েদেয়ে কম্বলের নিচে গিয়েছে সে প্রায় গোটা দশেকের সময়; এতক্ষণে ঘুম আসা উচিত ছিল, কিন্তু এল না; মাঝে মাঝে কিছুতেই চোখে ঘুম আসে না। কলেজ স্ট্রিটের বড়ো রাস্তার পাশেই মাল্যবানের এই দোতলা ভাড়াটে বাড়িটুকু; বাড়িটা দেখতে মন্দ নয়—কিন্তু খুব বড়োসড়ো নয়—পরিসর নেহাত কমও নয়। ওপারে চারটে ঘর আছে—তিনটে ঘরেই অন্য ভাড়াটে পরিবার থাকে—চিক দিয়ে ঘেরাও করে নিজেদের জন্যে তারা একটা আলাদা ব্লক তৈরি করে নিয়েছে—নিজেদের নিয়েই তারা স্বয়ংতুষ্ট—এদিককার খবর বড়ো একটা রাখতে যায় না।

ওপরের বাকি ঘরটি মাল্যবানদের; স্ত্রী উৎপলা ঘরটিকে গুছিয়ে এমন সুন্দর করে রেখেছে যে দেখলে ভালো লাগে। ধবধবে দেয়ালে গোটা কয়েক ছবি টাঙানো; একটা ব্রোমাইড এনলার্জমেন্ট; প্রৌঢ়ের, উৎপলার বাবার হয়তো, তার মার একটা অয়েলপেন্টিং; মাল্যবানের শ্বশুর পরিবারের আরো কয়েকটি লোকের ফোটোগ্রাফ—কয়েকটা হাতে আঁকা ছবি (কে এঁকেছে?)—ঘরের ভেতর একটা পালিশ

মেহগনি কাঠের খাট, খাটের পুরু গদির ওপর তোশকে বকপালকের মতো সাদা বিছানার চাদর সব সময়েই ছড়িয়ে আছে। দুজন মানুষ এই বিছানায় শোয়; উৎপলা (তাকে 'পলা' ডাকে তার সমবয়সীরা আর বড়োরা প্রায় সকলেই) আর তার মেয়ে মনু। মেয়েটির বয়স প্রায় নয় বছর। মাল্যবান ও উৎপলার এই বারো বছরের দাম্পত্য জীবনের মধ্যে এই একটি মেয়েই আছে। কোনো দিন আর কিছু হবে না যে তা-ও ঠিক। দোতলার এই ঘরটা বেশ বড়ো, মেঝে সব সময়েই ঝরঝরে, একটুকরো কাগজ, ফিতে, সেফটিপিন, পাউডারের গুঁড়ি পড়ে থাকে না কখনো; ঘরের ভেতর টেবিল চেয়ার সোফা কৌচ রয়েছে কতকগুলো; সবই বেশ পরিপাটি নয়, ছিঁড়ে গেছে, ময়লা হয়ে গেছে, কিন্তু উৎপলার যত্নের গুণে খারাপ দেখাচ্ছে না। এক কোণে একটা অর্গান রয়েছে; তারই পাশে একটা সেতার আর একটা এসরাজ; উৎপলার আলোর জিনিস; গাইতে ভালোবাসে, বাজাবারও সাধ খুব, প্রায়ই গুনগুন করে সব সকর্মতার ভেতর কোনো না কোনো একটা সুর ভাঁজছে, মাঝে মাঝে কীর্তনের সুরও; একেক সময়, বিশেষত বাথরুমে ধারাস্নানের সময়, বেশ জোরে গান গায় পলা। গানটান মাল্যবান কিছুই জানে না, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত খুব সহিষ্ণুভাবে স্ত্রীর ষড়জ ঋষভ গান্ধার-টান্ধার সহ্য করে যাওয়াই তার অভ্যাস, না হলে তা হয়ে উঠবে দুষ্ট সরস্বতী, তখন রক্ষা থাকবে না আর। কিন্তু তবুও বড়ো একঘেয়ে লাগে তার, স্ত্রীর গান বলেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত গান-বাজনার ওপর অত্যন্ত হতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে তার মন; কী করবে যে সে কিছুই ঠিক পায় না। মুখ চুন করবে, সঙ্গে সঙ্গেই কান ঝাঁ ঝাঁ করবে, চোখ জ্বলে উঠবে উৎপলার তাকে থামতে বললে, গান থামাতে বললে। এমনিতেই বউয়ের বিশেষ স্নেহশ্রদ্ধার মানুষ নিজেকে সে করে তুলতে পারেনি। মাল্যবানের স্বভাব ফটফটে ফিটকিরির মতন; সে নিজের মনে থাকা মানুষ; মানুষকে ক্ষমা করে যাওয়া অভ্যাস, অযথা

হই রই হিংসার ছোব ভালো লাগে না তার। শান্তি ভালোবাসে; নিজের সুখ-সুবিধে অনেকখানি ছেড়ে দিয়েও। গানের সম্পর্কে সে স্ত্রীকে কোনো দিন কিছু বলে না বড়ো একটা; বেশি ঝালাপালা বোধ করলে অবিশ্যি 'গান খুব ভালো করে শিখতে হয়', 'অনেকে খুব মন খুলে গায়, ভালো লাগে; মন খুলেছে বলে ভালো লাগে—' এ রকম এক-আধটা ইশারায় অনুযোগ জানায় মাল্যবান। এ ধরনের ইঙ্গিতের জন্যে স্ত্রীর কাছ থেকে সে সত্যিই শান্তি পায়; কাজেই পারতপক্ষে স্ত্রীকে কিছুই বড়ো একটা বলতে যায় না। নিজে মাল্যবান গানমুজরো না ভালোবাসে তা নয়। যখন সে কলকাতার চাকরিতে বাঁধা পড়েনি, পাড়াগাঁয়ে ছিল, সেই ছোটবেলা একেক দিন শীতের শেষ রাতে বাউলের গান শুনতে তার খুব ভালো লাগত; কোনো দূর হিজলবনের ওপার থেকে অন্ধকারের মধ্যে সে সুর ভেসে এসে তার কিশোর আঁতে ব্যথা দিয়ে যেত। কত দিন—যখন দিন শেষ হয়—দাণ্ডাগুলি খেলে যখন সে কাঁচা কাঁচা কালিজিরা ধানশালি রূপশালির খেতের আলপথ দিয়ে বাড়ি ফিরছে, ভাটিয়াল গান শুনে মনটা তার কেমন করে উঠত যেন; সারা দিনের সমস্ত কথা কাজ অবসন্ন শোল-বোয়ালের মতো দিঘির অতলে তলিয়ে যেত যেন, ঝির ঝির ফটিক ফটিক ঝিক ঝিক ঝর ঝর করে উঠত ওপরের জল: যে জল গানের মতো, যে গান জলের মতো চারদিককার খেজুরছড়ি, নারকোলঝিরঝিরি ঝাউয়ের শনশনানি ছায়া অন্ধকার একটি তারার ভেতর; এক কিনারে চুপ করে বসে থাকত সে। বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে কত রাত সে যাত্রা শুনতে গেছে—তারপর সেই সব গানের সুর এমন পেয়ে বসেছে তাকে যে পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করতে করতে একেকবার টেবিলের ওপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ নিঝঝুম হয়ে পড়ে থাকত; কোথাও মেঘ নেই, বৈশাখ আকাশের বিদ্যুচ্চমকানির মতো ভরে যেত মন এ কানা থেকে

সে কানায়; বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠবার পূর্বাভাসের মতো; কিন্তু তার আগেই সে মাথা খাড়া করে অন্য পৃথিবীতে চলে যেতে চেষ্টা করত, ফোঁপাতে যেত না। মণিভূপকণ্ঠ চক্রবর্তী বলে একজন ভদ্রলোক ছিলেন—সত্যিই কি তাঁর নাম মণিভূপকণ্ঠ?—কী মানে এই নামের?—কিন্তু তবুও সকলেই তো তাঁকে এই নামে ডাকত; মণিভূপের গানের কথা মনে পড়ে; শমনহরা বোস—ঝুনু—ঝুনু বোস—চৌধুরাণী নামেই বেশি খ্যাত—তার গান; সেসব দিন কোথায় গেছে যে আজ! পাড়ায় পাড়ায় গানের বৈঠকের লোভে পড়াশুনো ফেলে যেমনি সে আসরের এক কিনারে গিয়ে বসেছে, অমনি কাকা তাকে কান টেনেহিঁচড়ে বাসায় নিয়ে গেছেন; তবুও তার মায়ের সঙ্গে ষাট করে ফের আবার পালিয়ে যেতে ইতস্তত করেনি সে।

পলাকে এসব কথা কোনো দিন বলেনি মাল্যবান।

ওপরের ঘরটায় পলা (উৎপলা) আর মনু শোয়। একতলার ঘরে মাল্যবানের বিছানা বৈঠক—সমস্ত। এখানেই সে থাকে, কথা বলে, কাজ করে, বই পড়ে, লেখে, শোয়, ঘুমোয়। নিজে ইচ্ছা করে স্ত্রীর কাছ থেকে এ রকমভাবে বিচ্ছিন্ন হয়নি সে। দোতলার ওই একটা ঘরেই পলার ভালো করে কুলিয়ে ওঠে না তেমন, কাজেই সে স্বামীকে নিচের ঘরে গিয়ে শোবার ব্যবস্থা করতে বলেছে। অথচ দোতলার ঘরটা একতলার ঘরের চেয়ে ঢের বড়ো—আলো-বাতাস, রৌদ্র, নীল আকাশের আনাচকানাচ-কিনারা, মূল আকাশেরও বড়ো নীলিমার বেশ মুখোমুখি প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে, একতলার পাশেই প্রকাণ্ড ছাদের একটা আশ্চর্য প্রসৃতি রয়েছে, সিঁড়িটার দুধাপ মাত্র গেলেই একতলার সমস্ত ছাদটা, আকাশ রোদ, কলকাতার শহরটাই তোমার; যদি ভেবে নিতে পারো, তাহলে পৃথিবীর নগরনাগরের ইতিহাস বারণাবত ব্যাবিলনও তোমার চোখে ফুটে উঠেছে।

দুটি প্রাণী—ওপরে নিচে এই দুটি ঘরে আলাদা রয়েছে। মাল্যবানের বিয়ে হয়েছে প্রায় বারো বছর হলো। বিয়ের পর দু-তিন বছর পলা ঘুরেফিরে বাপের বাড়িতেই প্রায়ই থাকত; তারপর শ্বশুরবাড়িতে বছরখানেক থাকে, মনু হয়, মনুর ছমাস বয়সের সময়েই বাপের বাড়ি চলে যায় আবার, সেখানে বাবার মৃত্যু পর্যন্ত বছর দুই আরো কাটিয়ে এই বছর সাতেক ধরে কলকাতায় স্বামীর কাছেই রয়েছে।

রাত একটা। ডান কাত ফিরে মাল্যবান একটু ঘুমোতে চেষ্টা করল; নানা রকম কথা মনে হয়—ঘুম দূরে সরে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বাঁ কাত ফিরে মনে হলো এইবারে ঘুম এলে বেশ ভালো লাগবে। কিন্তু ঘড়িতে দেড়টা বাজল, তারপরে দুটো, ঘুম এল না; একেকটা রাত এ রকম হয়।

কম্বলটা ঠোঁট অব্দি টেনে নিয়ে চোখ বুজে আবার পাশ ফেরা গেল। কলকাতার রাস্তার নানা রকম শব্দ কানে আসে; রাত তো দুটো, শীতও খুব হুজ্জুতে, কিন্তু কাদের ফিটন যেন রাস্তার ওপর দিয়ে খটখট করে চলেছে: গাড়ির ভেতর মেয়েদের হাসি, বুড়ো মানুষের মোটা গলা, ছোটোদের চেঁচামেচি। মাল্যবান কম্বলের নিচে ফলি-কাত হয়ে থাকতে থাকতে ভাবছিল: তাই তো, কোথায় যাচ্ছ তোমরা মুনশিরা, ফিরছ কোত্থেকে? ঘোড়ার খুরের আওয়াজ অনেক দূর অব্দি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল, এমন সময় ইঞ্জিনের বিকট তড়পানিতে চারদিকের সমস্ত শব্দ গিলে খেল। এল, চলে গেল একটা লরি। মাল্যবানের মনে হলো লরির এই লবেজান আওয়াজেরও একটা সার্থকতা আছে: যেমন বালির থেকে তেল বার করতে পারা যায়, সে রকম; একে যদি চাকা-টায়ারের শব্দ না মনে করে বাদল রাতের ঝমঝম আওয়াজ ভেবে নেওয়া যায়, তবে বেশ লাগে লরির—খানিকটা চুনবালি খসে পড়ল চাতালের থেকে

মাল্যবানের নাকে-মুখে; বাড়িটার ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে, বাপ রে, একেবারে নিপ্পনের টাইডাল ওয়েভের মতো ছুটে গেছে লরিটা: নাকমুখ থেকে চুনকাম ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে মাল্যবান ভাবছিল। রাস্তা দিয়ে কাহার-মাহাতোরা একটা মড়া নিয়ে যাচ্ছে। কার যেন প্রাইভেট মোটর মাল্যবানদের বাড়ির কাছেই এসে থামল—গাড়িটা কী রকম বিগড়ে গেছে যেন; দু-চারজন মিস্ত্রি সেটা মেরামতের চেষ্টায় আছে; মবিল-অয়েলের গন্ধ মাল্যবানের নাকে ঢুকল, মন্দ লাগল না তার; একটা ষাঁড় ফুটপাত দিয়ে যেতে যেতে ঘঁগ-ঘড়ম করে উঠল একবার; সামনেই কাদের যেন দোতলার থেকে একটা বড়ো অস্পষ্ট কান্না ও ঝগড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, মাল্যবানের ঘরের পাশেই ড্রেনের কাছে একটা নেড়ি কুকুর ঘুরঘুর করে রাবিশের মতো ভেতর থাবা নখ চালিয়ে বালিঘড়ির বাজনা বাজিয়ে চলেছে যেন অনেকক্ষণ থেকে: কী চায় সে? কী পাবে? খানিকটা দূরে একটা বাড়ির ভেতরমহলে—হয়তো কলতলায়, ভাঁড়ার ঘরে, গুদোমে দুটো বেড়াল মরিয়া হয়ে ঝগড়া করছে অনেকক্ষণ ধরে; তাদের একটি নর ও একটি মাদি নিশ্চয়ই; এই শীতরাতে এই আশ্চর্য শীতে নিদারুণ কপট ঝগড়ার আড়ালে হুলো আর মেনির এই অত্যদ্ভুত রক্তোচ্ছ্বাস কাম নিয়ে জীবনের যৌনঋতুর, যৌন আগুনের এই প্রাণান্তকর দৌরাত্ম্যে—মাল্যবান দাঁত ফাঁক করে ভাবছিল, বেড়ালেরা লুটোপুটি ঝুটোপুটি কান্নাকাটি করে; বেশি বয়সে বিয়ে করেছিল, একজন সাদা দাড়িঅলা বুড়ো প্রফেসরকে ঠিক এই রকমই করতে দেখেছিল মাল্যবান প্রায় বছর সাতেক আগে—সন্ধ্যারাতেই, গলাখাঁকারি না দিয়ে প্রফেসর মশাইয়ের ঘরে রবারসোল জুতো পায়ে ঢুকে পড়েছিল মাল্যবান, কিন্তু এ রকম মইমারণ হইমারণ ব্যাপার যে হবে, তা তো ধারণা করতে পারেনি সে; কিন্তু সেই থেকে উপলব্ধি করেছে মাল্যবান যে সমস্ত ইতর প্রাণীকে বিশ্লেষণ করে যে মহৎ সংশ্লেষে

উপস্থিত হওয়া যায়, তারই আশ্চর্য সন্তাপ, উচ্ছ্বাস ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতরতাকে ভাঙিয়ে চারিয়ে জ্বালিয়ে নাচিয়েই মানুষ তো হয়েছে মানুষ। ভাবতে ভাবতে অবসন্ন হয়ে মাল্যবান কাত হয়ে শুয়ে পড়ল আবার। ঘড়িতে বাজল আড়াইটে, কিন্তু ঘুম তো এল না।

আজ ছিল তার জন্মদিনের তারিখ। বেয়াল্লিশ বছর আগে—এমনি অঘ্রান মাসের বিশ তারিখে কলকাতার থেকে প্রায় দেড় শ মাইল দূরে বাংলাদেশের একটা পাড়াগাঁয়ে সে জন্মেছিল। সেখানে খেজুরের জাঙ্গাল বেশি, তালের বন কম, সুপুরির গন্ধ হয়তো সবচেয়ে বেশি। এমনি শীতে খেজুরগাছের মাথা চেঁছে একটা নল বসিয়ে গলায় হাঁড়ি বেঁধে দেওয়া হয়, সমস্ত শীতের রাতে ফোঁটা ফোঁটা রস ঝরতে থাকে, মাছি-মৌমাছি ছোটো ছোটো রেতো প্রজাপতি, বড়োগুলোও, সেই হাঁড়ির রসে সাঁতার কাটছে, পাখনা নাড়ছে, মরে আছে; কুয়াশানির্জন ঠান্ডানিবিড় শেষ রাতে দেখা যায় এই সব। এমনি শীতের রাতে ধানের খেত শূন্য হয়ে পড়ে আছে—হলদে নাড়ার গ্যাঁজে সমস্ত মাঠ রয়েছে ছেয়ে, শীত পেয়ে দু-একটা বাঘ নেমে আসে; এমনি উদাস রাতে ফেউগুলো অন্তত খুব হাঁকড়ায়; শ্মশানে 'হরিবোল' যেন কোন দূর কুয়াশাপুরুষদের রলরোল বলে মনে হয়; লক্ষ্মীপেঁচা ডাকতে থাকে, ঘুম ভেঙে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় শীতের কুয়াশার যেকোনো অন্তিম পোচড়ের ফাঁকে ফাঁকে বৃহস্পতি কালপুরুষ অভিজিৎ সিরিয়াস যেন লণ্ঠন হাতে করে এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে কোন সুদূরযানের পথে চলেছে, কেমন একটা আশ্চর্য দূর পরলোকের নিক্বণ শোনা যায় যেন। কোনো দিন কুয়াশা কম—সাদা মেঘ আছে—একফালি গড়ানে মেঘের পাশে নিজের কেমন যেন একটা বৃহৎ আলোর শরীর নিয়ে থেমে আছে চাঁদ। পঁচিশ সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত পাড়াগাঁয় সে ফিরে ফিরে যেত, এই সব তার দেখবার শুনবার জিনিস ছিল, কিন্তু তারপর পনেরোটা বছর

কেটে গেল, এই শহরই হলো তার আস্তানা, একটা কাঁচপোকা মৌমাছি শামকল মৌচুষকি জোনাকির কথা মনেও পড়ে না তার, আকাশের নক্ষত্রগুঁড়িগুলোর দিকে ফিরেও তাকায় না সে।

ভাবতে ভাবতে আকাশের রুপালি সবজালি আগুনগুঁড়িগুলোর কথা ভুলে গেল সে। পনেরো বছর চাকরির পর গত মাসে আড়াই শ টাকা মাইনে হয়েছে, এর আগে মাইনে ছিল এক শ পঁচানব্বই; প্রায় পাঁচ বছর ধরে এক শ পঁচানব্বই টাকাই মাইনে ছিল; তার আগে মাইনের ব্যাপারে বড়ো গরমিল ছিল। সাহেবদের অফিস বটে, কিন্তু একসময় অফিসের অবস্থা এত খারাপ ছিল যে, যে নামমাত্র মাইনেয় মাল্যবান ঢুকেছিল, অনেক বছর পর্যন্ত তার দুর্ভোগ তাকে সহ্য করতে হয়েছে। এই সময় কোনো কোনো কেরানি অফিস ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু মাল্যবান যায়নি; বরং যত্ন করে এই অফিসেই খেটেছে সে; আজ রাতে তার মনে হয় তার অনেক দিনের খিদমদগারির পুরস্কার সে পেয়েছে।

খিদমদগারি? কী আর বলবে সে। পূর্বপুরুষেরা তাকে যেমন শক্তি সুযোগ দিয়েছেন, তাতে দেশের, মানুষের, আইনের, চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্যে, এমনকি পড়াশোনায়ও নিজেকে উৎসর্গ করবার কোনো পথ তার নেই। সেসব পথে যদি যেত, কেউই তাকে মানত না; মানত কি? লক্ষ্য উঁচু রাখলেও যে নিচে পড়ে ল্যাংচায়, কে মানে তাকে? কাজেই এই পনেরোটি বছর বসে ধীরে ধীরে বটমলি বিগল্যান্ড ব্রাদার্সের অফিসের জন্যে খেটেছে; কী করবে সে আর, কী করতে পারে?

বিএ পাস করে আইন পড়েছিল, কিন্তু তখনই এই অফিসের চাকরিটা পায়; চাকরিটা নিল সে।

মাঝে মাঝে মনটা ঝুমুর দিয়ে ওঠে বটে: উকিল হলে মন্দ হতো না, হয়তো, বেশ স্বাধীনভাবে থাকতে পারত, কারো তক্কাই রাখতে

হতো না, ব্যবসায়ে উন্নতি করতে পারলে মানুষের কাছ থেকে ঢের মর্যাদাও পাওয়া যেত। মনে হয় একেক সময়ে এই সব। কিন্তু মফস্বলের বার লাইব্রেরিগুলোর দিকে তাকিয়ে...কলকাতার বড়ো বড়ো এমএল, ডিএল, কী করে টাকা রোজগারের ব্যাপারে জেলা শহরের কমিটিপাস পিএলের কাছে হেরে যাচ্ছে কোথাও কোথাও—দেখেশুনে মনে মনে মাঝে মাঝে হাসে—অহংকারে নয়, আত্মসৌকর্যে নয়, কিন্তু নিজের ক্ষমতার খর্বতা হাড়ে হাড়ে অনুভব করে। মাল্যবান বুঝতে পেরেছে যে কাজ সে করছে, এর চেয়ে খুব বেশি ভালো কিছু কোনো দিনই সে করতে পারত না; হয়তো নিমকির দারোগা হতো কিংবা সুপারিনটেন্ডেন্ট, গভর্নমেন্টের চাকরির ছকে পড়ে গেলে একবার সবচেয়ে বড়ো কেরানি সাহেবও যে সে না হতে পারত তা নয়; টাকার দিক দিয়ে খানিকটা লাভ হতো বটে, টাকা সে চায়ও, খুবই চায়, কিন্তু আরো অনেক জিনিস চেয়েছিল সে: বিদ্যা সবচেয়ে আগে। অনেক দূর পর্যন্ত লেখাপড়া করবার সাধ ছিল, অনেক জিনিস শিখতে ইচ্ছা, বুঝতে ইচ্ছা; নিজের মনটা যে নেহাত কেরানির ডেস্কে আঁটা নিখেট, নিরেস কিছু নয়, মানুষকে সেটা বোঝাবার ইচ্ছা। নানা রকম ইচ্ছা—মনে অনেক রকম ভালো সুশৃঙ্খল কাঠকাঠামোর কথা জেগে ওঠে যে তার, মানুষকে সে তা জানাতে চায়; একেক সময় মনে হয় অফিসের কাজ ছেড়ে নিজের জীবনটাকে সে কোনো মহৎ কাজের ফেনশীর্ষে—ধরো কোনো উত্তেজনাময় কর্মীসংঘের মধ্যে নিয়ে ফেলুক; জীবনটাকে এ রকম অফিসে চেপে সাপটে মেরে লাভ কী? টাকা—পারিবারিক সচ্ছলতা—এগুলোকে এমন ঘাসের বিচি, ধুন্দুলের বিচি, রামকাপাসের আঁটি বলে মনে হয় একেক সময়। স্টিক হাতে নিয়ে গোলদিঘিতে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয়, একটা বড়ো বাজপেয়ে সভায় বেশ মার্জিত ভঙ্গিতে আবেগের বিরাট অকূলপাথারে নিজেকে

আশ্চর্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করে বক্তৃতা দেবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার; পলিটিকসে বাঙালিরা আজকাল গুজরাটি মারাঠি মাদ্রাজি ইউ, পিঅলাদের কাছে পদে পদে ভুড্ডু খেয়ে ফিরছে—ভাবতে ভাবতে রক্ত কেমন যেন হয়ে ওঠে তার, বাঙালির মান-সম্মান ফিরিয়ে আনবার জন্যে বড়ো নয়াল আগুনের মতো দাউ দাউ করে উঠতে ইচ্ছা করে তার—বিপ্লবের থেকে বিপ্লবে—ফ্রান্স, রুশ, স্পেন, চীন সমস্ত বিপ্লবের—ইয়ে—স্তনাগ্রচূড়ায় নতুন দুগ্ধের উল্লাসে নবীন পৃথিবীর জন্যে। ভাবতে ভাবতে বাঙালির কথা ভুলে যায় সে। অনেকক্ষণ পরে মাল্যবানের মাথা ঠান্ডা হয়; গোলদিঘির একটা বেঞ্চিতে ধীরে ধীরে চুপ করে গিয়ে বসে সে তখন; একটা বিড়ি জ্বালায়। খিদে পেয়ে ওঠে, বাড়ির দিকে রওনা হয়।

একটা কথা ঠিক: মাটির নিচে গেঁড় আর কন্দ খাওয়া শুয়োরের মতো (আপার গ্রেডের) অফিসগিরিই তার সব নয়; এক জোড়া রেশমি স্টকিং, বার্নিশ করা নিউ কাট, তসরের কোট, পরিপাটি টেরি, সিগারেট কেস ও ফুটবল গ্রাউন্ডের বেঞ্চি দিয়ে নিজেকে চোখ ঠার দিতে সে ভালোবাসে না। এই সবের চেয়ে সে আলাদা।

খবরের কাগজ সে রোজই পড়ে; কিন্তু স্পোর্টস রেস রাহাজানির দিকে একটু বেশি ঝুঁকে পড়ে নয়; কোথাকার অন্তঃপুরে, আদালতে কী রকম হাঁড়ি ভাঙল, বায়োস্কোপে কী থিয়েটারে কী আছে—এসব সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ বা আস্বাদ এ বেয়াল্লিশ বছরের মধ্যে এখনো সে তৈরি করে নিতে পারেনি। খবরের কাগজে তবুও সে আশাতীত প্রয়োজনীয় নানা জিনিস খুঁজে পায়; অফিসের থেকে ফিরে চুরুট জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ সে খবরের কাগজ নিয়ে বসে থাকে; একে একে মনের ভেতর নানা রকম সাধ-সংকল্প খেলা করে যায়; ভেঙে চুরমার হয়। তারপর অবসন্ন হয়ে পেপারটা সে রেখে দেয়; মনে থাকে না বিশেষ কিছু: কোনো কিছু সত্যিই শিখেছে বলে উপলব্ধি করতে পারে

না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে, নিজে সে অবিশ্যি পার্নেল বা চিত্তরঞ্জন হতে পারবে না—কোনো দিনও না—কোনো প্রক্রিয়ায়ও না—কিন্তু পার্নেল বা চিত্তরঞ্জন বাঙালির মধ্যে আজকালই যদি না জন্মায়, তাহলে এ জাতের ভরসা খুব কম। উনিশ শ উনত্রিশ সালের একটা রাত্তির: শুয়ে শুয়ে এই সব কথা ভাবছিল যখন মাল্যবান, সেই জন্যেই সে এই রকম ভাবছিল।

ঘড়িতে প্রায় সাড়ে তিনটে বাজল: মাল্যবান দেখল বিছানায় চিত-কাত হয়ে ভেবেই চলেছে ক্রমাগত; এত ভাবায় হৃদয় শুকিয়ে যায় শুধু, কোনো তীরতট পাওয়া যায় না, আসে না চোখে একপলক ঘুম। আস্তে আস্তে সে উঠে বসল; বিছানায় ছারপোকা আছে—কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত ছারপোকার জন্যে নয়; এর চেয়ে ঢের বেশি আরশোলা, ইঁদুর, মশা, পিসুর ঘাঁটিতে লম্বা নির্বিবাদে চৌকস ঘুমে কত রাত কাটিয়ে দিয়েছে। রাস্তার একটা গ্যাসল্যাম্পের আলো ঘরে ছিটকে পড়েছিল খানিকটা: স্লিপার খুঁজে নেওয়া গেল, পায়ে দিয়ে লাল-নীল চেককাটা কম্বলে সমস্ত শরীরটা মুড়ে সে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গিয়ে উঠল—নিঃশব্দে খানিকটা এগিয়ে, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখল, নেটের মশারির ভেতর মনু ও পলা কেমন নিশ্চিন্তভাবে ঘুমোচ্ছে—কেমন শান্ত, প্রীত নিশ্বাস তাদের। একটা ভারী নিশ্বাস প্রাণের ভেতর প্রচুর চুম্বনে টেনে নিল সে, সমস্ত শরীরকে আস্বাদগ্ধি করে আস্তে আস্তে নিশ্বাস ছাড়তে লাগল সে; ভালো লাগল তার। ভালোই লাগল তার ঘুমন্তদের দিকে তাকিয়ে: স্ত্রী-সন্তানকে সচ্ছলতায় রাখা, তাদের জীবনে খানিকটা সুখ-সুবিধে-শান্তির ব্যবস্থা করা—মাঝারি জীবনের এ উদ্দেশ্য এ শীতরাতে মাল্যবান সিদ্ধ দেখছে বলে। নিজের ঘুম হচ্ছিল না তার—এরাই-বা এই শীতের মধ্যে কী করছে: ঘুমিয়ে? জেগে? দেখবার জন্যেই সে ওপরে এসেছিল। দেখা হলো। মাল্যবান সুস্বাদ পেল, কেমন স্নিগ্ধ

শারীরিক মনে হলো তার রাত্রিটাকে, রাত্রির এই নিঝোর সময়টাকে। এখন নিচের ঘরে যেতে হয়। কিন্তু তবুও মাল্যবান গেল না সহসা। মশারির খুঁট তুলে এদের খাটের পাশে পাড়াগাঁর পৌষরাতের নিশ্চুপ ডানার পাখির মতো এসে স্নিগ্ধ নৈঃশব্দ্যে—এদের জাগিয়ে?—বসে থাকতে চায়। কিংবা বসবেও না: মনুর কপালে আলতো হাত বুলিয়ে দেবে—কম্বলটা স্ত্রীর বুক থেকে সরে গেছে, তুলে গুছিয়ে দেবে আলতো। তারপর নিজের ঘরে চলে যাবে সে।

কিন্তু নেটের মশারি তুলতেই ব্যাপারটা হলো অন্য রকম। উৎপলা জেগে উঠে প্রথম খুব খানিকটা ভয় খেলে; তারপর বিছানার ওপর উঠে বসে তার সমস্ত সুন্দর মুখের বিপর্যয়ে—মুহূর্তেই সে ভাবটা কাটিয়ে উঠে মরা নদীর বালির চেয়েও বেশি বিরসতায় বললে, 'তুমি!'

'এসেছিলাম।'

'এ সময় তোমাকে কে আসতে বললে।'

'দেখতে এলাম তোমরা কী করছ।'

'যাও, তোমাদের মেয়ে নিয়ে যাও, কাল থেকে এ আমার সঙ্গে আর শোবে না। মেয়েটার দাবনা ঘেঁষে, বাপ রে, একটা ডান যেন।'

'কে, আমি?' মাল্যবান দাঁড়িয়ে থেকে বললে। খাটে বসল না, একটা কৌচে বসে বললে, 'না, মেয়েটিকে শুধু দেখতে আসিনি, আমি—'

'আ, গেল যা! বসলে! রাতদুপুরে ন্যাকড়া করতে এল গায়েন। হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে কম্বল জড়িয়ে এ কোন ঢঙের বলির কুমড়ো সেজে বসেছে দেখো। ও মা। ও মা!—ও মা! বেরোও! বেরোও বলছি!'

'তুমি ঘুমোচ্ছিলে—তোমার ঘুম ভাঙাতে আসিনি তো আমি—'